Vol. 28 | No. 1 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত সাহিত্যে দূতকাব্য

Volume	28
Issue	1
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কল্পনা ভৌমিক
Published online	September 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v28i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i1.7
Pages	199-210
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সংস্কৃত সাহিত্যে দূতকাব্য

কল্পনা ভৌমিক

সংস্কৃত সাহিত্যে ''দূতকাব্য'' এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইংরেজী সাহিত্যে অনেকটা এই জাতীয় রচনা দেখা যায়--যার নাম 'লিরিক' বা গীতিকবিতা। গীতিকবিতা কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির ফসল। তা সহজ ও সাবলীল গতিতে গীতিমুখর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ-কারণেই গীতিকবিতা সাধারণতঃ দীর্ঘ হয় না, কারণ গীতিকবিতা তো একটি মাত্র অনুভতির প্রকাশ। গীতিকবিতা একটি খণ্ডিত কাব্য, তাই এতে পরিপূর্ণ মানব জীবনের ইংগিত পাওয়া যায় না, কেবল পাওয়া যায় তার অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগরিত একটি মাত্র ভাব বা আবেগকে। সংস্কৃত দূতকাব্যও অনেকটা এ-ধরনের। এখানেও সম্পূর্ণ মানবকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তার অংশ বিশেষকে। এটাই সংস্কৃত দূতকাব্য ও ইংরেজী লিরিক-এর মধ্যে সাদৃশ্য।

ইংরেজী 'লিরিক' কাব্যে সাধারণতঃ দেহনিষ্ঠপ্রেমই উপজীব্য বিষয়, কিন্তু সংস্কৃত দূতকাব্যে দেহনিষ্ঠ প্রেম ব্যতীত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বিষয়ক কাহিনীও স্থান পেয়েছে। বিষয়-বস্তুর দিক থেকে সংস্কৃত দূতকাব্যের ব্যাপকতা অনেক বেশী।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র মতে মহাকাব্যের বিশেষ বিশেষ কতগুলো দিক থাকবে--যেগুলো মেনে না চললে মহাকাব্য হবেনা।[১] সংস্কৃত দূতকাব্য মহাকাব্যের এ-সকল দিকগুলোর যে কোন একটি নিয়ে রচিত। তাই অলংকার-শাস্ত্র মতে দূতকাব্যকে 'খণ্ডকাব্য'ও বলা হয়ে থাকে। রাজা যেমন লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত, পারিষদবর্গ নিয়ে মহাসমারোহে যাত্রা শুরু করে—মহাকাব্যও তেমনি বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে অর্থাৎ তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসহ মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রা করে। অন্যদিকে 'দূত' যেমন

কোথাও থেকে (বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) অতি সাধারণভাবে একটি মাত্র খবর নিয়ে রাজার কাছে ছুটে আসে, ঠিক তেমনি এই খণ্ডকাব্যও যেন নিতান্তই সাধারণ ভাবে একটি মনের একটি মাত্র খবর নিয়ে অন্য একটি মনের দ্বারে হাজির হয়ে মৃদু আঘাতে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে একেবারে অন্তরলোকে পৌঁছে গিয়ে সেই প্রিয় খবরটি শুধায়। এজন্যই এই খণ্ডকাব্যকে দূতকাব্য বলা হয়েছে। কবির মন যখন তার প্রিয়তমের জন্য একান্ত আকুল হয়ে ওঠে—নিজের মনের একান্ত গোপন অথচ প্রয়োজনীয় কথাটা বলার জন্য হৃদয় আকুলিত হয়ে ওঠে, তখন মহাকাব্য সৃষ্টি করে তার মনের কথা বলার মত ধৈর্য বা মনের অবস্থা আর থাকেনা ; তখন প্রয়োজন হয় সংক্ষেপে মনের কথা বলার মত একটা যথাযোগ্য উপায় বা মাধ্যম আর সেটাই হচ্ছে—খণ্ডকাব্য বা দূতকাব্য। এ-কারণেই কবি বেছে নেন মহাকাব্যের একটি মাত্র দিক বা বৈশিষ্ট্যকে এবং সেটা সাধারণতঃ রসের দিক। মহাকাব্যে নবরসের 'শৃঙ্গার' অথবা 'বীর' যে কোন একটি থাকে প্রধান রস এবং অন্যগুলো অংগীরস হিসেবে বর্তমান থাকতে পারে। কিন্তু খণ্ডকাব্য বা দূতকাব্যে একটি মাত্র রসই বর্তমান থাকবে।[২] কালিদাস মহা-সমারোহে বিপুল প্রস্তুতি নিয়ে 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেছেন। কাব্যের শুরুতে তার সফল সমাপ্তির জন্য ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম জানিয়েছেন। কাব্যমধ্যে বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন রস, বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু 'মেঘদূতম্' রচনার বেলায় আমরা কি দেখতে পাই ?—এখানে দেখতে পাই অতি সাধারণ ভাবে কাব্যের শুরু—একটি মাত্র ছন্দের প্রয়োগ,[৩] একটি মাত্র ভাব এবং একটি মাত্র রসের প্রয়োগ। একই কবির মনে কেন এই দুই ধারার সৃষ্টি হল ? এর উত্তরে বলতে হয়—মহাকাব্য রচনার বেলায় কবি তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন এবং মেঘদূত রচনা করেছেন হৃদয়ের টানে একটি মাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে। এখানে কোন প্রচেষ্টা নেই—সব যেন সহজ সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত ; এখানে তাঁকে চিন্তা করে কিছু বলতে হয়নি—মনের একান্ত গোপন অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলো যেন পাহাড়ী ঝর্ণার জলের মত তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাইতো এখানে সমারোহ নেই, সাজ-গোছ নেই—আছে কেবল সহৃদয়তার কোমল পরশ। কবি দেখেছেন—তাঁর অত্যন্ত জরুরী খবরটা ব্যক্ত করতে হলে বেশী সময়

নেয়া চলবে না, রাজকীয় প্রস্তুতি নেয়া চলবেনা—অত্যন্ত সাদামাটাভাবে এবং সংক্ষেপেই তা বলতে হবে। এখানে বিদ্যা-বুদ্ধির গভীরতা দেখানোর অবকাশ নেই। তাই তিনি বেছে নিয়েছেন মহাকাব্যের একটি মাত্র দিককে; কাব্য শুরু করেছেন একজন নির্বাসিত যক্ষকে নিয়ে যে এক অতি সাধারণ ব্যক্তি, কুবেরের কর্মচারী, কোন রাজাধিরাজ কিংবা মুনি-ঋষি বা দেবতা নয়। এক কথায় বলা যায়—মহাকাব্য হচ্ছে কবির কবিত্ব শক্তির প্রকাশ আর দূতকাব্য হচ্ছে তার সহৃদয়তার মূর্ত প্রতীক।

কবিতার জগতে 'সনেট' যা, গল্পের জগতে 'ছোটগল্প' যা, কাব্য-জগতে 'দূতকাব্য'-ও তা। সনেট এবং ছোটগল্প যেমন একটি মাত্র ভাব এবং একটি মাত্র বক্তব্যকেই অতিশয় মনোহারী করে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করে, দূতকাব্যই ঠিক তেমনি একটি মাত্র ভাব ও একটি মাত্র বক্তব্যকেই পাঠকদের উপহার দেয়। এখানে থাকেনা বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা; নিতান্তই সহজ সরল একটি বক্তব্যই এর উপজীব্য বিষয়। দূত-কাব্যের এরূপ গঠনরীতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বলা যায় বা মনে হয়—মহাকাব্যের পরেই এর সৃষ্টি হয়েছে। কারণ কবি যখন মহাকাব্যের মত বিরাট যজ্ঞ সম্পন্ন করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন তখনই তার মনে স্থান পেয়েছে এই চিন্তা—কি করে সংক্ষেপে মনের কথা বলা যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে যতগুলো দূতকাব্য আছে তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—চেতন ও অচেতন। যে কাব্যে কোন চেতন পদার্থ অর্থাৎ কোন জীবকে 'দূত' করে খবর পাঠানো হয়েছে, তা হল চেতন এবং কোন অচেতন পদার্থকে 'দূত' করে যে কাব্য রচিত হয়েছে, তা অচেতন শ্রেণীর কাব্য। চেতন, যেমন: হংসদূত, অচেতন মেঘদূত — ইত্যাদি। এ-যাবৎ যে-সকল দূতকাব্যের নাম জানা গেছে সেগুলো হচ্ছে-মেঘদূত, চেতদূত, মনোদূত, মেনদূত, পবনদূত, হৃদয়দূত, শিলাদূত, শ্রীকৃষ্ণপদাংকদূত, বাতদূত, চন্দ্রদূত, ও নেমীদূত, (এগুলো অচেতন শ্রেণীর কাব্য): কপিদূত, হংসদূত, পিকদূত, শুকসন্দেশ, চকোরসন্দেশ, ময়ূরসন্দেশ, ভ্রমরদূত, ভৃঙ্গ-সন্দেশ, কোকিলসংবাদ, পান্থদূত, বংশীসংবাদ ও উদ্ধবদূত (এগুলো চেতন শ্রেণীর কাব্য)। এদের মধ্যে কয়েটি আছে শুধু নামেই পরিচিত, পাণ্ডু-লিপি হিসেবে পাওয়া যায়নি, তাই সেগুলো সম্পর্কে আপাততঃ অধিক

কিছু বলা যাচ্ছে না। যে-গুলোর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে সে-গুলো হচ্ছে—মেঘদূত, শ্রীকৃষ্ণপদাংকদূত, হংসদূত, কপিদূত, মনোদূত, পিকদূত, ও উদ্ধবদূত; এবং এগুলো সম্পর্কেই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

হংসদূত: এটা শ্রীরূপদেব গোস্বামী রচিত ১৪১টি শ্লোকের একটি দূতকাব্য। কাব্যটিতে ব্যবহৃত ছন্দ 'শিখরিণী'। কাব্যের বিষয়-বস্তু মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিরহিণী রাধিকার করুণ বিলাপ এবং হংসমুখে বার্তা প্রেরণ। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করার জন্য বিন্দাবনবাসী-সহ শ্রীমতি রাধিকাকে ত্যাগ করে মথুরায় গিয়েছেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। কৃষ্ণবিরহে রাধা আকুল। অতীতের কথা স্মরণ করে করে তার দুঃখ আরও বেড়ে যাচ্ছে। ললিতাসহ কালিন্দীতীরে বেড়াতে গিয়ে রাধা এক হংসকে দূত করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে খবর পাঠাচ্ছেন। এই-ই কাব্যের বিষয়-বস্তু। কাব্যের সমাপ্তি বাক্য থেকে প্রতীয়মান হয়—কবি ছিলেন কৃষ্ণ-ভক্ত—"ইতি শ্রীযদুনাথপদার বৃন্দাস্বাদমত্তম ধুপশ্রীরূপদেব বিরচিতং হংসদূতাখ্যং কাব্যং সমাপ্তম্।" শ্রীরূপদেব গোস্বামী চৈতন্য দেবের সমসাময়িক। চৈতন্যদেব-এর জন্ম খৃঃ ১৪৮৫ এবং মৃত্যু খৃঃ ১৫৩৩। অতএব, নির্দ্বিধায় বলা যায়—কাব্যটি খৃঃ ১৫শ শতকের শেষ অথবা ১৬শ শতকের প্রথম ভাগে রচিত হয়েছে।

মেঘদূত: মেঘদূত মহাকবি কালিদাস রচিত এক অমর সৃষ্টি। কাব্যটি দুটি পর্বে বিভক্ত—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। পূর্বমেঘে আছে দক্ষিণে রামগিরি থেকে উত্তরে অলকা পর্যন্ত মেঘের যাত্রাপথের বর্ণনা; উত্তরমেঘে আছে যক্ষেশ্বরের (কুবেরের) মনোহারিণী অলকাপুরীর মনোজ্ঞ বর্ণনা এবং যক্ষ-প্রিয়ার বর্ণনা। কাব্যের বিষয়-বস্তু অতি সাধারণ অথচ মহাকবির অনুভূতি স্পর্শে তা অসাধারণ হয়ে সর্বকালের সর্বমানবের অন্তরে স্থান লাভ করেছে। কুবেরের এক অনুচর ছিল যক্ষ। তার কাজ ছিল প্রত্যহ সকালে প্রভুর পূজা দেয়ার জন্য ফুল তুলে দেয়া। কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রভু তাকে অভিশাপ দিলেন—এক বছর তাকে নির্বাসনে থাকতে হবে। তাই অলকায় তার গৃহ এবং গৃহিনীকে ত্যাগ করে যক্ষকে আসতে হয়েছে সুদূর দক্ষিণে রামগিরিতে। সেখানে সে স্ত্রীর শোকে পাগল-প্রায়। হঠাৎ কোনও এক আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে যক্ষ দেখতে পেল এক খণ্ড মেঘ গিরিশৃঙ্গে

আশ্রয় নিয়েছে। যক্ষ তাকেই পূজার্চনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করে তার দ্বারা প্রিয়তমার কাছে খবর পাঠাল যে, সে বেঁচে আছে এবং শাপশেষ হলেই তাদের পুনর্মিলন হবে। কাব্যটি 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে রচিত। পূর্বমেঘে শ্লোক সংখ্যা ৬৪ এবং উত্তরমেঘে শ্লোক সংখ্যা ৫৪। কাব্যের রচনা-কাল ম্যাক্-ডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে খৃঃ ৫ম শতক; ম্যাক্সমুলার ও ফারগুসান প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে খৃঃ ৬ষ্ঠ শতক এবং স্যার উইলিয়াম জোন্স্ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে মেঘদূতের রচনাকাল খৃঃ পূঃ প্রথম শতক। কীথ আবার বিভিন্ন প্রমাণ দেখিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কালিদাসের আবির্ভাবকাল খৃঃ ৪র্থ শতক। এটাকেই পণ্ডিতগণ মোটামুটি কালিদাসের কাল বলে মেনে নিয়েছেন।

কপিদূত : এটাও একটি সম্পূর্ণ দূতকাব্য। তবে কাব্যটির ১-১১ পর্যন্ত শ্লোকগুলো পাওয়া যায়নি। ঘটকর্পর 'রচিত ঘটকর্পর' কাব্যের সাথে এই কাব্যটির শেষ অংশ (১২-৫৫ পর্যন্ত শ্লোক) পাওয়া গেছে। কাব্যটিতে শ্লোকসংখ্যা ৫৫। এই পুঁথিটিতে ১১ নং শ্লোকের শেষ অংশ আছে। কাব্যটি 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে রচিত। পুঁথিটিতে ১-১১ পর্যন্ত শ্লোকগুলো 'ঘটকর্পর' কাব্যের। কপিদূত কাব্যের কবি কে তা কাব্যের মধ্যে (১২-৫৫ পর্যন্ত শ্লোকে) পাওয়া যায়নি। তবে ঘটকর্পর কাব্যের ১-১১ পর্যন্ত শ্লোক এবং কপিদূতের ১২-৫৫ পর্যন্ত শ্লোকের লিখন-পদ্ধতি ও বর্ণ-সাদৃশ্য থেকে এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এই দুটি কাব্যই একই ব্যক্তির রচিত এবং একই হাতে লিখিত। তাই যদি হয় তাহলে ঘটকর্পরকেই 'কপিদূত'-এর কবি বলে স্বীকার করতে হয়। হয়তো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ওলট-পালট হয়ে গেছে। তাই একটার মধ্যে আর একটা ঢুকে গেছে। কপিদূতের কবি যদি ঘটকর্পর-ই হন তাহলে এটা মেঘদূতের সমসাময়িক, কারণ কালিদাস এবং ঘটকর্পর একই সময়কার এবং একই রাজার সভাকবি (নবরত্নের দুই রত্ন) ছিলেন।[৪] কালিদাস খৃঃ পূঃ ১ম শতক কিংবা খৃঃ ৪র্থ শতকের হলে ঘটকর্পরও তাই।

কপিদূতের এই একটি মাত্র কপিই পাওয়া গেছে। এই কপিটির ৩৫তম শ্লোকের কিছু অংশ থেকে ৩৯তম শ্লোকের প্রথম দিকের কিছু অংশ পর্যন্ত অবশ্য অন্য হস্তাক্ষরে লেখা বলে মনে হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে

কেউ হয়তো কবিকে লিখতে সাহায্য করেছে কিংবা এও হতে পারে—হস্তাক্ষরে অর্থাৎ লেখায় বৈচিত্র্য আনার জন্য কবি নিজেই এরূপ করেছেন। এমন অনেকেই আছেন যারা বিভিন্ন ভঙ্গীতে লিখতে পারেন।

কাব্যটির যে অংশটুকু (১২-৫৫) পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় কাব্যটির বিষয়-বস্তু হচ্ছে — সীতা হনুমানকে দূত করে রামের কাছে পাঠিয়েছেন। হনুমান রামের কাছে এসে সীতার দুরবস্থার কথা বলছে, রামের বিহনে সীতার অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করছে। তা শুনে রামও বিলাপ করছেন; কেঁদে কেঁদে বলছেন—"হে হনুমান! আমি কি পুনরায় জানকীর চাঁদমুখ দেখতে পাব? তার প্রিয় সম্ভাষণ শুনতে পাব?"...ইত্যাদি। এতে আছে কিভাবে রাবন তাকে (সীতাকে) অপহরণ করে তার লঙ্কাপুরীর অশোক কাননে রেখেছিল। জটায়ু যখন রামকে বলল-"সীতাকে রাবন নিয়ে গেছে লঙ্কায়" তখন রাম সীতার খোঁজে হনুমানকে পাঠিয়ে-দিলেন লঙ্কায়। মনে হয় সীতা সেই হনুমানকেই দূত করে আবার রামের কাছে পাঠিয়েছেন। রামায়ণের ঘটনাকেই বিষয়-বস্তু করে কবি কপিদূত কাব্য রচনা করেছেন। অবশ্য কাব্যটির প্রথম অংশ পাওয়া গেলে এসব সমস্যার সমাধান হতে পারবে।

শ্রীকৃষ্ণপদাংকদূত : এটা শ্রীকৃষ্ণসার্বভৌম রচিত একটি দূতকাব্য। ৪৫টি শ্লোকে কাব্যটি সমাপ্ত। কাব্যটি 'মন্দাক্রান্তা" ছন্দে রচিত। কাব্যটির উৎস মহাভারত। কোনও কমলাক্ষি গোপী কৃষ্ণবিরহে আকুলা। দূতী-মুখে ভুল খবর পেয়েছে যে কৃষ্ণ যমুনাতীরে মঞ্জুকুঞ্জে অবস্থান করছেন। এই খবর শুনে তিনি আলুথালু বেশে স্খলিত কবরীতে দূতীসহায় সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু হায়! গিয়ে দেখেন প্রাণবল্লভ আর সেখানে নেই। কৃষ্ণকে না পেয়ে তিনি মূর্চ্ছা গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে দেখতে পেলেন কুলিশ-কমল-অঙ্কুশাদিযুক্ত শ্রী কৃষ্ণের মনোহর পদচিহ্ন। অগত্যা কৃষ্ণপাগলিনী প্রমত্তা গোপী নির্জীব নিশ্চল নির্বাক সেই পদচিহ্নকেই দূত করে পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে। গোপী ভাবলেন—কৃষ্ণ যেখানেই যান না কেন এই পদাংক সেখানেই যাবে। অর্থাৎ পদাংক যেখানেই শেষ হয়েছে তার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই রয়েছেন। তাই এই পদাংকের কাছেই তার বক্তব্য (দুঃখের কথা) বললে নিশ্চয়ই তা কৃষ্ণের কাছে

পৌঁছবে। এই ভেবে গোপী শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের কাছেই তার অন্তরের আকুল বেদনা প্রকাশ করেছেন। অপূর্ব কবির ভাবনা শক্তি। প্রেম যে মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায় কবি তা এখানে সুন্দর ও সার্থক ভাবে প্রকাশ করেছেন। এরূপ নিদর্শন কালিদাসের মেঘদূতেও দেখা যায়। কবি সেখানে বলেছেন—কামার্ত ব্যক্তি স্বভাবতই চেতন-অচেতন পদার্থের প্রভেদ নির্ণয়ে অক্ষম হয়।[৫]

মনোদূত : মনোদূত শ্রীবিষ্ণুদাস কবীন্দ্র রচিত ১০০টি শ্লোকে সমাপ্ত একখানা দূতকাব্য। কাব্যটি 'বসন্ততিলক' ছন্দে রচিত। কাব্যের প্রথমেই কবি শ্রীকৃষ্ণের জয়গান করেছেন, "শ্রীগোপীজন বল্লভো জয়তি।" কাব্যের বিষয়-বস্তু কৃষ্ণপদে মনোনিবেশ করা। কোনও এক সংসারী ব্যক্তি (কবি নিজে?) সংসারের সুখ-দুঃখ ও লোভ-মোহাদি দ্বারা অতীষ্ঠ হয়ে মুক্তির পথ অন্বেষণ করছে। নিত্য যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারাও পরম মোক্ষ লাভ করা সম্ভব নয়। তার মতে সংসারের সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে লোভ-মোহাদি পরিত্যাগ পূর্বক শম-দমাদির অভ্যাসের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণপদে মনোনিবেশ করতে পারলেই পরম মোক্ষ লাভ করা যাবে। অর্থাৎ ঐ সংসারবিরাগী ব্যক্তি সংসারের সব আসক্তি ত্যাগকরে শুদ্ধচিত্তে তার মনকে শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেরণ করেছেন। তাই কাব্যটির নাম হয়েছে মনোদূত। মন যেন কৃষ্ণের প্রতি তার যত আকুলতা-ব্যাকুলতা-আসক্তি-ধ্যান-ধারণা-চিন্তা, সব নিয়ে কৃষ্ণের কাছে গমন করছে। এই কাব্যটিতে দেখা যায় মোক্ষ-বিষয়ক ঘটনাকে উপজীব্য করে কবি কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যের পাণ্ডুলিপিতে সময়ের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এর কাগজ, কালি, বর্ণ, লেখার পদ্ধতি—এসব বিচার-বিশ্লেষণ করে একে ১৮শ শতকের কাব্য বলে মনে হয়। তাছাড়া ১৮শ শতক হচ্ছে বৈষ্ণবীয় শতক। এই সময় বঙ্গদেশে কৃষ্ণপ্রেমের ঢল নেমে ছিল। কবি বিষ্ণুদাসও একজন বাংগালী এবং কাব্যের বিষয়-বস্তুও কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কিত। তাই এ-থেকেও বলা যায় যে, কাব্যটি ১৮শ শতকেই রচিত হয়েছে।

উদ্ধবদূত : 'উদ্ধবদূত' শ্রীমাধব কবীন্দ্র ভট্টাচার্য বিরচিত ১৩৯টি শ্লোকে সমাপ্ত একখানা দূতকাব্য। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে কংসকে বধ করে সেখানে বসবাস করছেন। এদিকে বৃন্দাবনবাসী তাঁর শোকে কাতর। তারা শ্রীকৃষ্ণকে

একান্ত ভাবে ফিরে পেতে চায়। কৃষ্ণসান্নিধ্যের জন্য তাদের চোখে অবিরল অশ্রু ঝরে; প্রতি অঙ্গ আকুলিত, রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তাদের এই আকূতি নিয়ে উদ্ধব এসেছেন মথুরায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন-বাসীদের বিরহ-ব্যাথার কথা বলেছেন। এই-ই কাব্যের বিষয়-বস্তু। কাব্যটি "মন্দাক্রান্তা" ছন্দে রচিত। এর লিখন পদ্ধতি, বর্ণ, কাগজ, কালি ইত্যাদি থেকে অনুমিত হয় যে, কাব্যটি ১৬শ থেকে ১৮শ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীরূপগোস্বামীকৃত অন্য একখানা 'উদ্ধবদূত' আছে। তাতে শ্লোক সংখ্যা ১৩০টি।

পিকদূত : ১০১টি শ্লোকে 'শার্দূলবিক্রীড়িত' ছন্দে রচিত একখানা দূত কাব্য। কবি শ্রীরুদ্রনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্য। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরী থেকে মথুরায় গিয়েছেন। তাঁর বিরহে সমস্ত ব্রজবাসী আকুল। গোপীগণ দুর্বার মদন তাপে দগ্ধহৃদয়। শ্রীরাধিকা উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক সময় 'কুহুরব' শুনতে পেলেন। পাগলিনীর ন্যায় কোকিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে রাধা তাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন—মথুরায় (নবপুরে) গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তার মনোবেদনা জানাতে। কাব্যটিতে কৃষ্ণবিরহিনী রাধিকার বিরহচিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পিকদূতের বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় কাব্যটি ১৬শ থেকে ১৮শ শতকে রচিত হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে দূতকাব্যের প্রভাব : ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের যে সব প্রমাণ এ-যাবৎ আমাদের হাতে আছে তাতে অশ্বঘোষকেই প্রাচীনতম কবি বলে ধরা হয়। তাঁর পরে মহাকবি ভাস। অশ্বঘোষ খৃঃ ১ম শতকের কবি। তিনি মহাকাব্য, নাটক এবং স্তোত্র বা গাথা জাতীয় সাহিত্য রচনা করেছেন। ভাস অশ্বঘোষের পরবর্তী খৃঃ ২য় শতকের কবি। তিনি কেবল মাত্র ১৩খানা নাটকই রচনা করেছেন। এঁদের দুজনের কেউই দূতকাব্য বা এই জাতীয় কাব্য রচনা করেননি। দূতকাব্যের পরিচয় আমরা পাই কালিদাসের আমলে এসে। কালিদাসের কাল পণ্ডিতদের মতে মোটামুটি খৃঃ ৪র্থ শতক। যেহেতু এর পূর্বে দূতকাব্যের অস্তিত্বের কথা আমরা আজও জানতে পাইনা, সেহেতু বলা যায়—কালিদাসই প্রথম দূতকাব্য রচনা করেছেন। মহাকাব্যের মত বিরাট গ্রন্থ ; বিভিন্ন রস, বিভিন্ন চরিত্র

এবং বিভিন্ন রুচির সমন্বয়ে নাটকের মত কঠিন কাব্য (সংস্কৃত সাহিত্যে যে কোন রচনাকেই কাব্য বলে) রচনা করতে করতে কবি যখন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তখনই মনে হয় দূতকাব্যের মত সহজ, সংক্ষিপ্ত ও আবেগময় কাব্য রচনার প্রেরণা বা তাগিদ কবির মনে এসেছিল। দূরস্থ প্রিয়জনকে মনের আবেগ-আকূতি জানানোর এক শ্রেষ্ঠ ও সহজ উপায় হচ্ছে দূতকাব্য। এ-কারণেই দূতকাব্য পরবর্তী কালে কবি ও পাঠকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন কবির লেখনী একের পর এক 'দূতকাব্য' রচনা করতে থাকে। এবং দেখা যায় খৃঃ ১৮শ শতক পর্যন্ত দূতকাব্য রচিত হয়েছে। কালিদাসের পরে নাটক, মহাকাব্য এবং অন্যান্য জাতীয় কাব্যও রচিত হয়েছে। কিন্তু তাদের তুলনায় দূতকাব্যের সংখ্যা অনেক বেশী। এক রাধা-কৃষ্ণের বিরহ নিয়েই রচিত হয়েছে ৪ / ৫ (এর অধিকও হতে পারে) খানা দূতকাব্য।[৬] এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ৪র্থ থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত দূতকাব্য কবি ও পাঠকদের মধ্যে অসম্ভব রকমের জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বলেই এতগুলো দূতকাব্য রচিত হয়েছে। পাঠক যা সাদরে গ্রহণ করে—যা পড়ে আনন্দ পায়—মুগ্ধ হয় এবং আরও বেশী করে দাবী করে সেই কাব্য রচনারই কবির আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। প্রথম দূতকাব্য পড়ে পাঠক আনন্দ পেয়েছে আর কবিও আগ্রহ ভরে সৃষ্টি করেছেন একের পর এক দূতকাব্য। পাঠকদের রুচির দ্বারাও কোন ভাষার সাহিত্য প্রভাবিত হয়। আবার কোন কবির সার্থক নতুন সৃষ্টির দ্বারাও সাহিত্য প্রভাবিত হয় (যেমন—আমাদের বাংলা সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছিল মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত "মেঘনাদবধ কাব্য" দ্বারা)। পাঠক যা পছন্দ করে কবি তা-ই রচনা করে আনন্দ পান। আবার কবি নতুন ও সুন্দর কিছু রচনা করেও পাঠকদের আনন্দ দিতে পারেন। ফলতঃ এই উভয়বিধ ভাবেই কোন একটা ভাষার সাহিত্য প্রভাবিত হয়। দেখা যায়—দূতকাব্যের দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যও প্রভাবিত হয়েছিল। কালিদাসের নব সৃষ্টি "মেঘদূত" পেয়ে তখনকার পাঠক-সমাজ খুশী হয়েছিল। তারা কবির কাছে আরও "মেঘদূত" দাবী করেছিল এবং পাঠকদের এই দাবী মেটাতে গিয়েই খৃ: ১৮শ শতক পর্যন্ত কবিদের রচনা করতে হয়েছে একের পর এক দূতকাব্য। সংস্কৃত সাহিত্য এই দূতকাব্য থেকে যেন এক বিপুল ঋদ্ধি লাভ করেছিল।

অন্যান্য দূতকাব্যের উপর মেঘদূতের প্রভাব : কালিদাসের পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে দূতকাব্য রচিত হয়েছে কি-না কিংবা হলেও তার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি। যে প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে তার দ্বারাই আলোচনা শেষ করতে হবে। 'মেঘদূত' ব্যতীত আর যে-সব দূতকাব্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি সেগুলো সবই মেঘদূতের পরে রচিত হয়েছে। খৃঃ ১৮শ শতকে রচিত, দূতকাব্যও[৭] আমাদের হাতে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল — পরবর্তী কালে যে সব দূতকাব্য রচিত হয়েছে তাদের উপর মেঘদূতের প্রভাব পড়েছে কি-না। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এর কোন যথার্থ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে এটুকু বলা যায় — পূর্বতন কোন ভাল জিনিষের প্রভাব পরবর্তী কালের জিনিসের উপর স্বাভাবিক ভাবেই পড়ে থাকে। এ বিষয়ে কালিদাসের মেঘদূত যথার্থই উল্লেখযোগ্য। মেঘদূতের রচনাকাল খৃঃ ৪র্থ শতক (আ.)। দূতকাব্য হিসেবে মেঘদূত যে একখানা শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক কাব্য তা সর্বসুধী-জনস্বীকৃত। পরবর্তী কালের কবিগণ যে মেঘদূত অনুসারে বা অনুস্মরণে দূতকাব্য রচনা করে থাকবেন, এতে সন্দেহ বা আশ্চর্যের কিছু নেই। কালিদাসের উপর যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব পড়েছে; কালিদাস যেমন রামায়ণে রামকর্তৃক সীতার কাছে হনুমানকে পাঠানোর ঘটনা অনুকরণে মেঘদূত রচনা করেছেন; তেমনি পরবর্তীকালের কবিদের উপরও হয়তো মেঘদূতের প্রভাব পড়েছিল এবং এর থেকেই তারা দূতকাব্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। মেঘদূত 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে রচিত। দেখা যায়—পরবর্তীকালের কয়েকটি দূতকাব্যও[৮] 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে রচিত হয়েছে। এর থেকে অবশ্য এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায় না যে, মেঘদূত দেখেই মেঘদূতের ছন্দে তারা কাব্য রচনা করেছেন। তবে এ-রকম যে হতেও পারে একথা বলতে দোষ নেই। আর পরবর্তীকালের কবিরা যে মেঘদূত পড়ে থাকবেন বা মেঘদূত সম্পর্কে অবগত থাকবেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ কালিদাস ছিলেন ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের এক রত্ন। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কথা তখন ভারতবর্ষের কারো অজানা থাকার কথা নয়, বিশেষ করে কবি-মহলে। কালিদাসের মেঘদূতের প্রভাব যে কেবল দূতকাব্যেই পড়েছে তা নয়—অন্য কাব্য রচনায় কিংবা অন্যান্য কাব্যের সমালোচনা কিংবা টীকা

রচনা করতে গিয়েও টীকাকারগণ মেঘদূতের স্মরণ করেছেন। ঘটকর্পর রচিত 'ঘটকর্পর' কাব্যের টীকা রচনা করতে গিয়ে টীকাকার শ্রীকালিকান্ত শর্মা (আ. খৃ. ১৫-১৭শ শতক) মেঘদূতের একটি শ্লোকের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন :

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিনাং স কিং পূর্নবদ সংস্থে ॥৯

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সংস্কৃত দূতকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলো হচেছ—নায়ক হবে দেবতা অথবা রাজা কিংবা সদ্বংশজাত কোন ব্যক্তি। 'শৃঙ্গার' অথবা 'বীর' রস হবে মুখ্য, অন্যান্য রস 'অঙ্গী' রস হিসেবে থাকবে বা থাকতে পারে; আটের অধিক সর্গ থাকবে; মুখ্য ঘটনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ঘটনাও সন্নিবেশিত হতে পারে… ইত্যাদি।

২ মেঘদূতে একটি মাত্র রস—শৃঙ্গার, কিন্তু রঘুবংশে আছে—'বীর' রস (মুখ্য) এবং 'করুণ' ইত্যাদি অঙ্গীরস।

৩ মেঘদূতে একটিমাত্র ছন্দ—মন্দাক্রান্তা, কিন্তু রঘুবংশে—উপেন্দ্র বজ্রা, ইন্দ্র বজ্রা, রথোদ্ধতা ইত্যাদি।

৪ "ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুর্বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য।"—এই শ্লোকটি সংস্কৃত সাহিত্যে খুবই প্রচলিত।

৫ "কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।"—মেঘদূত। পূর্বমেঘ—৫ নং শ্লোক।

৬ হংসদূত, শ্রীকৃষ্ণপদাংকদূত, উদ্ধবদূত, পিকদূত, এগুলো সবই রাধা-কৃষ্ণের বিরহ নিয়ে রচিত দূতকাব্য। রাধা-কৃষ্ণের বিরহ নিয়ে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যেও দূতকাব্য রচিত হয়েছে, যেমন-কোকিলসংবাদ, বংশীসংবাদ ইত্যাদি।

৭ মনোদূত, উদ্ধবদূত, পিকদূত ইত্যাদি খৃ. ১৬শ থেকে ১৮শ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

৮ কপিদূত, শ্রীকৃষ্ণপদাংকদূত, উদ্ধবদূত ইত্যাদি 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে রচিত।

৯ এই চরণ দুটি মেঘদূতের পূর্বমেঘের ৩ নং শ্লোকের শেষ অংশ। তবে এখানে শেষ চরণের রেখাংকিত অংশটুকু মেঘদূতে অন্যরকম।—সেখানে আছে, "…জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।" এটা হয়তো লিপিকরপ্রমাদ।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিগুলির পরিচয়

কাব্যের নাম	সংগ্রহ-শালা	পুথি-সংখ্যা
মেঘদূত	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার	২১২৯ এ
শ্রীকৃষ্ণপদাংকদূত	ঐ	১২৪৭ / ২০০ এ
উদ্ধবদূত	ঐ	২৯৮ সি
হংসদূত	ঐ	১৬০১
মনোদূত	ঐ	২৭৭১
পিকদূত	ঐ	৪১৬ ই
কপিদূত	ঐ	১৭৫ বি
কোকিলসংবাদ (বাংলা)	ঐ	১৫১
বংশীসংবাদ (বাংলা)	ঐ	১৫২
ঘটকর্পর	ঐ	১২৫০ / ১২৪১